শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক অবদান

বঙ্গবন্ধু সরকার (১৯৭২-৭৫)

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

"আপনি চাকরি করেন, আপনার মায়না দেয় ঐ গরীব কৃষক, আপানার মায়না দেয় ঐ জমির শ্রমিক, আপনার সংসার চলে ঐ টাকায়, আমি গাড়িতে চলি ঐ টাকায়। ওদের সম্মান করে কথা বলেন, ওদের ইজ্জত করে কথা বলেন। ওরাই মালিক।" - বঙ্গবন্ধু

"এই স্বাধীনতা তখনি আমার কাছে প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে, যেদিন বাংলার কৃষক-মজুর ও দুঃখী মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে।"- বঙ্গবন্ধু

"আমাদের চাষীরা হল সবচেয়ে দু:খী ও নির্যাতিত এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্যে আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পেছনে নিয়োজিত করতে হবে।" - বঙ্গবন্ধু

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
www.mole.gov.bd

ভূমিকা

স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, মেহনতি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন। জাতির পিতা যেমন ছিলেন বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার, তেমনি তিনি 'দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর' জন্য ছিলেন দৃঢ় প্রতীজ্ঞ। ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত ন্যাম শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, "বিশ্ব আজ দুই ভাগে বিভক্ত, একদিকে শোষক আর অন্যদিকে শোষিত-আমি শোষিতের পক্ষে।"

স্বাধীনতার জন্য সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক ও ধারাবাহিক সংগ্রাম এবং ৯ মাসের মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অঙ্গীকার শ্রমিক-কৃষকসহ মেহনতি মানুষের শোষণ মুক্তির মাধ্যমে একটি মর্যাদাসম্পন্ন ও সামাজিক ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

শিল্প-কারখানা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ ও শ্রমিকদের অধিকার

১৯৭২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ঘোষিত রাষ্ট্রপতির ১৬নং আদেশ (চঙ-১৬)-এর আওতায় অবাঙালি তথা পাকিস্তানি মালিকানার প্রায় ৮৫ শতাংশ শিল্প-কারখানা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয় এবং রাষ্ট্র সেগুলোর মালিকানা গ্রহণ করে।

এই 'পরিত্যক্ত সম্পত্তিগুলো' জাতীয়করণ আইনের মাধ্যমে 'রাষ্ট্রায়ত্ত খাত' হিসেবে অভিহিত হয়। বঙ্গবন্ধুর সরকার স্বাধীনতার প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে (২৬.০৩.১৯৭২-এ) পাট, বস্ত্র, চিনিকল, ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয়করণের আইন পাস করে। জাতীয়করণ আইনের আওতায় ৬৭টি পাটকল, ৬৪টি বস্ত্রকল এবং ১৫টি চিনিকল জাতীয়করণ করা হয়। জাতীয় বিমান সংস্থা ও জাতীয় শিপিং সংস্থা যা পূর্বেও সরকারি মালিকানায় ছিল আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অধীনে আনা হয়। এভাবে ১৫ কোটি টাকা মূল্যের স্থায়ী সম্পদ বিশিষ্ট পরিত্যক্ত ও অনুপস্থিত মালিকদের শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও বৈদেশিক বাণিজ্য জাতীয়করণ করা হয়। তিনি পরিত্যক্ত কলকারখানা জাতীয়করণ করে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী এবং শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন।

জাতীয়করণ কর্মসূচি বঙ্গবন্ধুর সরকার হঠাৎ করেই গ্রহণ করেন নি। এটি ছিল '৭০-এর নির্বাচনের সময় ঘোষিত আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। তা ছাড়া ছাত্রদের ১১-দফা দাবিতেও দেশের পাট, বস্ত্র, চিনিকল ও ব্যাংক-বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয়করণের (৫নং দাবি) দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এমনকি ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের দেওয়া ঐতিহাসিক ২১-দফা কর্মসূচিতেও পাট শিল্প জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

ঐতিহাসিক মে দিবস উদযাপন ও শ্রমিকদের মজুরির হার বৃদ্ধির ঘোষণা প্রদান

শ্রমিকদের অধিকার ও দাবির প্রতি সম্মান দেখিয়ে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে মে দিবস পালিত হয়। স্বাধীনতার পর মে দিবস রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পায় এবং জাতির পিতা মে দিবসে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর শাসনভার গ্রহণের সময় রাষ্ট্রীয় কোষাগারে যে অর্থ ছিল তা দিয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন দেওয়া সম্ভব ছিল না। তবুও সদ্য স্বাধীন দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক হিসেবে বঙ্গবন্ধু সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নতুন বেতন কমিশন গঠন করে ১০ স্তর বিশিষ্ট নতুন বেতন স্কেল বাস্তবায়ন করেন। বঙ্গবন্ধু শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে মজুরি কমিশন গঠন করেন। তিনি শ্রমিকদের জন্যও নতুন বেতন কাঠামো ঘোষণা করেন। ১৯৭২ সালে মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে তৎকালীন সরকার প্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি শ্রমিকদের মজুরির হার বৃদ্ধি এবং যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত শ্রমিকদের এডহক সাহায্য প্রদানের ঘোষণা দেন।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলওর সদস্য পদ অর্জন

জাতির পিতা বন্ধবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর উদ্যোগে বাংলাদেশ ১৯৭২ সনের ২২ জুন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদস্য পদ লাভ করে। একই দিনে বাংলাদেশ আইএলওর ২৯টি কনভেনশন অনুসমর্থন করে। এটি একটি বিরল ঘটনা এবং শ্রমজীবি মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও তাঁদের অধিকার রক্ষায় এক অনন্য স্বীকৃতি। ২২/০৬/১৯৭২ তারিখে অনুসমর্থনকৃত কনভেনশনসমূহের মধ্যে ৫টি কনভেনশনই ছিল আইএলও'র মৌলিক কনভেনশন। সর্বপ্রথম ০৭-২৭ জুন, ১৯৭২ সময়ে অনুষ্ঠিত ৫৭তম আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে ত্রিপক্ষীয় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। জাতির পিতার ঐকান্তিক আগ্রহে ১৯৭৩ সনের ২৫ জুন ঢাকায় আইএলওর অফিস স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশে আইএলওর কার্যক্রমের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সদস্য পদ লাভ করে।

শ্রমনীতি প্রণয়ন

স্বাধীনতাপূর্বকালে দেশে কোন কল্যাণমূখী শ্রমনীতি ছিল না। তাই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন সময় প্রণীত বিধি-বিধানের ভিত্তিতেই দীর্ঘকাল এদেশের শ্রমবলয় নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। স্বাধীনার পরপরই ১৯৭২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু সরকার প্রথম শ্রমনীতি ঘোষণা করেন। শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তখন এ নীতি প্রণয়ন করা হয়েছিল। সেই শ্রমনীতিতেই মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়ন, শিল্পে শান্তি ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ সুরক্ষা এবং কল্যাণের প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় সেক্টরের সকল শিল্প কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিক কর্মচারীদের মজুরী ও আর্থিক সুবিধাদি জাতীয় মজুরী বোর্ড এর সুপারিশক্রমে প্রদান করা হবে মর্মেও এই শ্রমনীতিতে উল্লেখ করা হয়।

কৃষি ও অন্যান্য খাতে নিয়োজিত শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কার্যক্রম

বঙ্গবন্ধু সরকার আমলের শুরুতেই সুদসহ কৃষকদের সব বকেয়া খাজনা ও ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির কর চিরদিনের জন্য বিলোপ করা হয়। নির্যাতনমূলক ইজারাদারি প্রথা বিলুপ্ত করা হয়। কৃষকের কল্যাণে ৭০ কোটি টাকা বকেয়া সুদ-খাজনা ও কর মওকুফ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর সররকার প্রায় ১৬ কোটি টাকার টেস্ট রিলিফ জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করে। দরিদ্র্য চাষিদের ১০ কোটি টাকার ঋণ, ১ লাখ ৯০ হাজার টন সার, ২ লাখ মণ বীজধান দেওয়া হয়। সমবায়ের মাধ্যমে ৪ কোটি টাকা বিতরণের প্রকল্প চালু করা হয়। ফলে কৃষি খাতে নিয়োজিত শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের পথ সম্প্রসারিত হয়।সেসময় জেলেদের মাঝে মাছ ধরার আধুনিক সরঞ্জাম, ন্যায্যমূল্যে জাল বোনার সুতা ও নৌকা নির্মাণের জন্য উপকরণ বিতরণ করা হয়। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু তাঁত শিল্পকে গুরুত্ব দিয়ে তাঁতিদের জন্য রং, সুতা থেকে শুরু করে তাঁতের জন্য যা যা প্রয়োজনীয় সব উপকরণ সহজলভ্য করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠাকরণ

দেশগঠনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো সংবিধান প্রণয়ন করা এবং সংবিধানে শ্রমিক বান্ধব নীতি গ্রহণ করা । গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর তারিখে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে এই সংবিধান গৃহীত হয় এবং একই বছরের ১৬ই ডিসেম্বর অর্থাৎ বাংলাদেশের বিজয় দিবসের প্রথম বার্ষিকী হতে এটি কার্যকর হয়।

সংবিধানে জাতীয় চার নীতির অন্যতম নীতি হিসেবে 'সমাজতন্ত্র' যুক্ত করা হয়। যার মর্মার্থ হলো শোষণবিহীন সমাজ। জাতির পিতা সংবিধানে মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তির কথা বলা হয়েছে: রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে মেহনতী মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিকের-এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।

সংবিধানের ১৫(খ) অনুচ্ছেদে কর্ম ও মুজরীর অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে: কর্মের অধিকার অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করে যুক্তিসংগত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার; যুক্তিসংগত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার।

সংবিধানের ৩৪ অনুচ্ছেদে জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে: সকল প্রকার জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধ; এবং এই বিধান কোনভাবে লংঘিত হইলে তাহা আইনত: দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

সংবিধানের ৪০ অনুচ্ছেদে পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে: আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের এবং যে কোন আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার অধিকার থাকিবে।

শিল্প শ্রমিক মজুরি কমিশন গঠন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে সরকারী মালিকানাধীন জাতীয়করণকৃত ও সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমুহে নিয়োজিত শ্রমিকদের মজুরী কমিশন গঠন করেন। শ্রমিকদের জীবন ধারণের ব্যয় বৃদ্ধি ও সংশ্লিষ্ট নানাবিধ কারণে শ্রমিকদের মজুরি কাঠামো ও প্রান্তিক সুযোগ সুবিধা পুনর্বিবেচনা করাই ছিল এই কমিশন গঠনের মূল উদ্দেশ্য। গঠিত মজুরি কমিশনের প্রতিবেদনের আলোকে বঙ্গবন্ধু'র সরকার ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭৩ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের এনআইডি-৩৭/৭৩/৯৫৮ নং প্রজ্ঞাপনে পাবলিক সেক্টরের শিল্প শ্রমিকদের প্রথম মজুরী কাঠামো এবং প্রান্তিক সুবিধাদি ঘোষণা করে।

বিভিন্ন সেক্টরের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ

বঙ্গবন্ধু'র সরকার ১৯৭২ সনের নভেম্বরে ব্যক্তিমালিকানাধীন পরিবহন ও ১৯৭৪ সালে স'মিল এবং ১৯৭৫ সালে সিনেমা হাউজ শ্রমিকদের জন্য প্রথম বারের মত ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করে। এছাড়া, ১৯৭৫ সালে প্রিন্টিং প্রেস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি পুন:নির্ধারণ করা হয়।

শ্রম পরিদপ্তর পুনর্গঠন

১৯৭২ সালে স্বাধীন দেশের উপযোগী করে শ্রম ও সমাজ কল্যাণবিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা হয়। বঙ্গবন্ধুর সরকারের আমলে শ্রমিকদের কল্যাণে তৎকালীন শ্রম পরিদপ্তরকে ঢেলে সাজানো হয়। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে শ্রম পরিদপ্তর ও ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন পরিদপ্তর কে একীভূত করে শ্রম পরিদপ্তর পুনর্গঠন করেন।

নতুন আইন প্রণয়ন ও বিদ্যমান আইন সমূহের বাস্তবায়ন

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে 'সংবাদপত্র কর্মচারী (চাকরির শর্তাবলী) আইন' ও 'শিশু আইন' প্রণয়ন করেন। বর্ণিত শিশু আইনে শোষিত বা কাজে লাগানো শিশুর শ্রমের ফল যে ব্যক্তি ভোগ করবে তাকে দুষ্কর্মে সহায়তার জন্য দায়ী করে শাস্তির বিধান রাখা হয়। এছাড়া বঙ্গবন্ধু সরকার মজুরি পরিশোধ, শিশুশ্রম রোধ, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, শ্রমজীবীদের ক্ষতিপূরণ ও স্বার্থ সংরক্ষণবিষয়ক আইনগুলোর বাস্তবায়ন শুরু করেন। সেসময় দেশের শ্রমজীবী মানুষ যাতে করে জাতীয় উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে নিজেকে অংশীদার বলে ভাবতে পারেন তার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-কারখানার পরিচালকদের মধ্যে শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধিত্ব সংবলিত আইন প্রণয়নের নির্দেশ জারি করা হয়।

জাতীয় শ্রম উপদেষ্টা বোর্ড গঠন

শ্রম ক্ষেত্রে সকল নীতি বিষয়ক আলোচনায় শ্রমিক ও মালিকের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব অনুধাবন করে বঙ্গবন্ধু সরকার ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ২১ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় শ্রম উপদেষ্টা বোর্ড গঠন করেন।

LIST OF 29 ILO CONVENTIONS RATIFIED BY BANGLADESH in 1972

[Date of Ratification: 22.06.1972]

Immediately after the independence, the Government of the People's Republic of Bangladesh with the initiative of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman ratified about 29 ILO conventions of which 5 were core conventions including C-87 and C-98, concerning right to organize and collective bargaining to ensure and uphold the workers right in Bangladesh. Since then the Trade Union Movement has got special momentum in Bangladesh. The trend is still continuing.

Fundamental/Core Conventions		
Sl. No.	**Name of the Convention**	**Convention No.**
1.	Forced Labour Convention, 1930	29
2.	Freedom of Association & Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No. 87)	87
3.	Right to Organize & Collective Bargaining Convention, 1949.	98
4.	Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105)	105
5.	Discrimination (Employment & Occupation) Convention, 1958	111

Other Conventions		
Sl. No.	**Name of the Convention**	**Convention No.**
6.	Hours of works (Industry) Convention, 1919	1
7.	Night Work (Women) Convention, 1919	4
8.	Night work of Young Persons (Industry) Convention, 1919	6
9.	Right of Association (Agriculture) Convention, 1921	11
10.	Weekly Rest (Industry) Convention, 1919	14
11.	Minimum Age (Trimmers & Stokers) Convention, 1921	15
12.	Medical Exam. of Young Persons (sea) Convention, 1921	16
13.	Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention, 1925	18

Sl. No.	Name of the Convention	Convention No.
14.	Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention,1925	19
15.	Inspection of Emigrants Convention, 1926	21
16.	Seamen's Articles of Agreement Convention, 1926	22
17.	Marking of Weight (Packages Transported by vessels) Convention, 1929	27
18.	Protection Against Accident (Dockers) (revised) Convention, 1932	32
19.	Underground work (women) Convention, 1935	45
20.	Minimum Age(Industry) (revised) Convention, 1937	59
21.	Final Articles Revision Convention, 1946	80
22.	Labour Inspection Convention, 1947	81
23.	Night Work (Women) convention (revised) 1948	89
24.	Night Work of Young Persons (Industry) (revised) Convention, 1948	90
25.	Fee-charging Employment Agencies Convention (revised) 1949	96
26.	Weekly Rest (commerce & offices) Convention, 1957	106
27.	Indigenous & Tribal Population Convention, 1957	107
28.	Final Articles Revision Convention, 1961	116
29.	Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962	118

১৯৭২ সালের ১লা মে জাতির উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

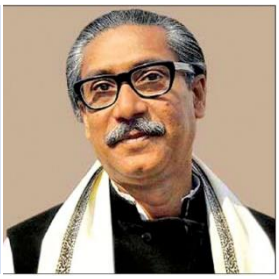

আমার প্রিয় শ্রমজীবী ভাই ও বোনেরা,

স্বাধীন বাংলার মুক্ত মাটিতে এবারই সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক মে দিবস পালিত হচ্ছে। বাংলার মেহনতী মানুষ শৃঙ্খলমুক্ত পরিবেশে এই দিনটিকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করার অধিকার অর্জন করছে, এজন্য দেশ ও জাতি আজ গর্বিত। মহান মে দিবস শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের এক জ্বলন্ত প্রতীক। সারা বিশ্বের শোষিত বঞ্চিত নীপিড়িত মানুষের বিশেষ করে আজকের এ দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলার মেহনতী মানুষ, বিশেষ করে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবক যাঁরা সম্রাজ্যবাদী শোষণ, প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের জুলুম এবং ঔপনিবেশিক জালেমদের বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীনতার ইতিহাস লিখে গেলেন, তাঁদের ত্যাগ ও তীতিক্ষার কথা বাংলাদেশের মানুষ কোনদিন ভুলবে না। তাঁরা আর কোনদিন আমাদের কাছে কোন দাবী দাওয়া নিয়ে আসবেন না। কিন্তু এই লাখো লাখো শহীদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে এদেশের ইতিহাসে। যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশের মানুষ দেশ গড়ার সংগ্রামে তাঁদের কাছ থেকে পাবে প্রেরণা। তাই আজকের এই মহান দিনে আমার দেশের শ্রমজীবি মানুষদেরকে আমি শোষণহীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকায় নেমে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমার প্রাণপ্রিয় দেশবাসী

আপনারা অতীতে বারবার আমার ডাকে সাড়া দিয়ে নির্ভীক সংগ্রামে কাঁপিয়ে পড়েছেন। আমার বিশ্বাস, এবারও আপনারা আমার আহ্বানে মনে প্রাণে এগিয়ে আসবেন। অতীতে আমরা একটি মর্মান্তিক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাঁধা পড়ে গিয়েছিলাম। গুটি কয়েক সুবিধাবাদী ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জাতীয় সম্পদ ও শ্রমজীবী মানুষের উৎপাদন নিজেদের কুক্ষিগত করে রেখেছিল। দেশ আজ স্বাধীন। সম্পদের মালিক জনগণ। তাই কোন শ্রেণীবিশেষের ভোগ লালসার জন্য এবং লোভ চরিতার্থ করার নিমিত্তে এই সম্পদকে অপচয় করতে দেওয়া হবে না। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সমাজতন্ত্র কায়েম করা। এই ব্যবস্থায় দেশের সমুদয় উৎপাদিত ও প্রাকৃতিক সম্পদ কৃষক শ্রমিক ও সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে

সুষমভাবে বন্টন করা হবে। যদিও বাধা অনেক, সমস্যার শেষ নেই, তবুও লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে।

আমার সংগ্রামী দেশবাসী

আপনারা জানেন, আমাদের বর্তমান জাতীয় উৎপাদন সাড়ে সাত কোটি দারিদ্র-পীড়িত মানুষের ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত নয়। শত শত বছর ধরে আমরা একটা নিকৃষ্ট উপনিবেশ এবং বিদেশীদের বাজার হিসেবে লুণ্ঠিত হয়েছি। বিদেশীরা দেশের অর্থনীতিকে জনগণের প্রয়োজনের উপযোগী করে গড়ে তোলেনি। এরপরে ইয়াহিয়ার বর্বর সৈন্যরা আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে এ দেশের অর্থনীতিকে পুনঃর্গঠনের কাজে হাত দিয়েছে। আমরা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির গোড়াপত্তন, করেছি। পাশাপাশি দুঃখী জনগণের অভাবমোচন ও দূর্দশা লাঘবের জন্য আমাদের সাধ্যমত আশু সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে। সুদসহ কৃষকদের সমস্ত বকেয়া খাজনা ও পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির কর চিরদিনের জন্য বিলোপ করা হয়েছে। লবণ উৎপাদনকে আর আবগারি শুল্ক দিতে হবে না। নির্যাতনমূলক ইজারাদারী প্রথা বিলুপ্ত করা হয়েছে। সরকার প্রায় ষোল কোটি টাকার টেস্ট রিলিফ জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করেছে। দরিদ্র চাষীদের দশ কোটি টাকার ডাকাতি ঋণ, এক লাখ নব্বই হাজার টন সার, দু'লাখ মন বীজ ধান দেওয়া হয়েছে। সমবায়ের মাধ্যমে চার কোটি টাকা বিতরণ করা হবে। যুদ্ধবিধ্বস্ত ও স্কুল ঘর পুনঃনির্মাণ ও ছাত্র-শিক্ষকদের সাহায্যের জন্য প্রায় দশ কোটি টাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোকে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুক্তিসংগ্রামের সময় ক্ষতিগ্রস্ত ২৮৭টি রেল সেতুর মধ্যে ২৬২ টির এবং ২৭৪টি সড়ক সেতুর মধ্যে ১৭০টির মেরামতের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ করা হয়েছে। বাকীগুলির কাজ বর্ষার আগে শেষ করার জন্য আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা অবিরাম পরিশ্রম করে চলেছেন। স্বাধীনতার প্রাক্কালে ব্যাংক, বীমা থেমে গিয়েছিল। দক্ষ পরিচালকের অভাব, খুচরা যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল এবং ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের টানাটানি শিল্পজীবনে নিশ্চয়তা এনে দিয়েছিল। শূন্য হাতে সরকার ব্যাংক, বীমা পুঁজিবিনিয়োগ সংস্থা এবং শিল্প কারখানাভিত্তিক সক্রিয় করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অতীতে কতিপয় সুবিধাভোগী দেশের সমুদয় সম্পদের সিংহভাগ ভোগ করতো। বর্তমান ব্যবস্থার চূড়ান্ত পর্যায়ে কৃষক, শ্রমিক, দরিদ্র ও বঞ্চিত লোকেরা উপকৃত হবেন। এ জন্যই সরকারের উপর অত্যন্ত গুরুতর সত্ত্বেও আমরা চলতি বৎসরের ছাব্বিশে মার্চ আমাদের অর্থনীতির কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যেমন- ব্যাংক, বীমা, সমগ্র পাট, বস্ত্র ও চিনি শিল্প, আভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন ও বৈদেশিক বাণিজ্যসহ শিল্প কারখানার একটা বিরাট অংশ জাতীয়করণ করেছি। পুরাতন পুজিবাদী পদ্ধতির ফলে সমাজতান্ত্রি পদ্ধতি কায়েমের পথে এটা একটা সুস্পষ্ট দুঃসাহসীক পদক্ষেপ। নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। সমাজতান্ত্রি

অর্থনীতি পুরাপুরিভাবে গড়ে তোলার কাজ আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে। এখানেই শ্রমজীবীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হলে, তাঁদের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হবে, আমরা এখন আর পুঁজিপতি প্রভূদের ভোগের জন্য সম্পদ উৎপাদন করতে যাচ্ছি না। এখন যা উৎপাদন হবে তা শ্রমিক-কৃষক এবং বাংলাদেশের সব মানুষের কল্যাণে লাগবে।

সমাজতন্ত্রের শত্রুরা এই লক্ষ্য অর্জনে বাঁধা এবং জাতীয়করণ কর্মসূচির সাফল্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে চায়। শ্রমিকরা সরকারের সঙ্গে একযোগে কাজ করে সমাজতন্ত্রের শত্রুদের ধ্বংস করতে পারেন। কিন্তু এটা করতে হলে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শ্রমিকরা যে ভূমিকা পালন করেছেন, সে দৃষ্টিভঙ্গীর ও আচরণের আমল পরিবর্তন আনতে হবে। তাঁদের অবশ্যই উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে এবং সম্পদকে রক্ষা করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে শিল্পোৎপাদনের সুফল সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ চাষী ভাইদের ভোগ করতে দিতে হবে। সুতরাং জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল দাবী দাওয়া পেশের মনোভাব ত্যাগ করা দরকার। এক কথায় সমাজতান্ত্রিক শৃঙ্খলা ছাড়া সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েম করা সম্ভব নয়।

ভায়েরা আমার,

শ্রমিকরা যাতে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন সেজন্য আমি ইতিমধ্যেই শ্রমিক নেতাদের সাথে শিল্প-কারখানা পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে একটি তীব্র প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেছি। নতুন ভূমিকা পালনের জন্য শ্রমিকদের যেমন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হচ্ছে তেমনি সরকারি প্রশাসনকে নতুন করে ঢেলে সাজানো দরকার। সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য সরকারি কর্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। সরকারের উচ্চ ও নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারীদের বেতনের ক্ষেত্রে যে বিরাট ব্যবধান ছিল তা কমিয়ে আনার জন্য বেতন কাঠামোর পুনঃর্বিন্যাস করার উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় বেতন কমিশন গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারী চাকরির এই নয়া কাঠামোতে কর্মচারীরার জাতীয় পুনঃর্গঠন সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। গত কয়েক মাসে জনসাধারণ যে সাহস ও ধৈর্য্যরে পরিচয় দিয়েছেন সেজন্য আমি তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। বেকারত্ব ও অত্যাবশ্যকীয় জিনিসের দূর্মুল্য আমাদেরকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি? আমরা জনসাধারণের দুঃখ দূর্দশা সম্পর্কে সজাগ রয়েছি এবং পরিকল্পিত উপায়ে এ সমস্যার মোকাবিলার জন্য অবিরাম কাজ করে যাচ্ছি।

জনগণের জানা আছে, আমদানী কমে যাওয়ায় এবং উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় বাজারে জিনিসপত্রের অভাব হয়েছে। যুদ্ধে বন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থা ও কারখানাগুলি ক্ষতিগ্রস্থ ও বিকল হয়ে যাওয়ার ফলে আমরা বিশেষ অসুবিধার সম্মুখিন হয়েছিলাম। কিছু সংখ্যক এজেন্ট, অসৎ ব্যবসায়ী ও কালোবাজারীরা পণ্যদ্রব্য গুদামজাত করে বেশ খানিকটা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করেছিল। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সামগ্রিক চাহিদা মেটানোর জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ইতিমধ্যে খাদ্যশষ্যের আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এপ্রিল মাসে প্রায় দু'লক্ষ চল্লিশ হাজার টন খাদ্য শস্য বিদেশ থেকে আনা হয়েছে। মে মাস নাগাদ আরো তিন লক্ষ পচাশি টন খাদ্যশস্য আসছে। আমাদের প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্র ভারত সাড়ে সাত লক্ষ টন এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সদস্য ও বন্ধুরাষ্ট্রসমূহ আমাদের প্রায় সাত লক্ষ টন খাদ্যশস্য দেবার আশ্বাস দিয়েছেন। এর ফলে খাদ্য শস্যের দাম ক্রমান্বয়ে কমে যাবে আমার বিশ্বাস। খাবার তেল, কেরোসিন প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। মোটামুটিভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেই জিনিসপত্রের দাম আরো কমে যাবে।

আমার ভাই ও বোনেরা,

আমাদের সমগ্র পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশের মধ্যে রয়েছে বন্টন ও সরবরাহ ব্যবস্থার পূনঃবির্ন্যাস করা। ইতিমধ্যেই বেসরকারী ডিলার, এজেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্তক করে দেয়া হয়েছে যে, যদি তারা অসাধু ও সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ না করে তাহলে তাদের সকল লাইসেন্স, পারমিট বাতিল করে দেয়া হবে। আশু ব্যবস্থা হিসেবে সরকার প্রতি ইউনিয়নে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে সমবায় ভিত্তিতে ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর ফলে বেসরকারী ব্যক্তিদের বন্টনের ক্ষেত্রে একচেটিয়া কর্তৃত্বের অবসান ঘটবে এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে সামরিক স্বল্পতার সুযোগে যুক্তিহীন মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা রোধ হবে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার সাথে সাথে বেতনের লোকদের জন্য আমরা কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করেছি। আপনারা জানেন, জিনিসপত্রের দাম না কমিয়ে কেবল বেতন বাড়িয়ে দিলেই জনসাধারণের অসুবিধা দূর হয় না। কাজেই মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আমরা ইতিপূর্বে বর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছি। সেই সাথে আমরা মনে করি এই দূর্মূল্যের বাজারে টিকে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত নিম্ন আয়ের মানুষের কাছে কিছু আর্থিক সাহায্য দেয়া দরকার। আপনাদের সরকার স্বতঃস্ফুর্ত হয়ে দেশের গরীব সরকারী কর্মচারীদের জন্য কিছু আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করেছে। স্বায়ত্তশাসিত ও অর্ধ-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক, পুলিশ, জাতীয় রক্ষীবাহিনী, বাংলাদেশ রাইফেলস, দেশরক্ষা বাহিনী, রাষ্ট্রায়ত্ত ও সরকার পরিচালিত শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সদস্য ও শ্রমিকরা এই বাড়তি সাহায্য পাবেন। আজ থেকে এটা কার্যকরী হবে এবং আগামী পহেলা জুনের বেতনের সাথে আপনারা এই বাড়তি টাকা

পেয়ে যাবেন। যে সকল সরকারী কর্মচারী প্রতি মাসে ৩৫৫ টাকা পর্যন্ত মূল বেতন পান তাঁদের সাময়িক ভিত্তিতে সরকার এই হারে পর্যন্ত মাসিক ২৫ টাকা।

১। মাসিক বেতন ১২৫ টাকা পর্যন্ত মাসিক টাকা ২৫ টাকা।

২। মাসিক বেতন ১২৬ টাকা থেকে ২২৫ টাকা পর্যন্ত মাসিক ২০ টাকা। এই শ্রেণীভূক্ত কর্মচারীরা সর্বনিম্ন মাসিক ১৫০ টাকা পাবেন।

৩।মাসিক বেতন ২২৬ টাকা থেকে ৩৩৫ টাকা পর্যন্ত মাসিক ১৫ টাকা।

ক) এই শ্রেণীভূক্ত কর্মচারীরা সর্বনিম্ন ২৪৫ টাকা পাবেন।
খ) যে সকল কর্মচারীরা মাসিক ৩৪৯ টাকা পর্যন্ত বেতন পান তাঁদের জন্য মার্জিনাল এডজাস্টমেন্ট করা হবে।

যেসকল বেসামরিক কর্মচারী প্রতিরক্ষা বরাদ্দ হতে বেতন পান বা যাঁরা ওয়ার্ক চার্জড, এবং কনটিনজেন্ট কর্মচারী, তাঁদের বেলায়ও এই আদেশ প্রযোজ্য হবে। এই সাময়িক সুবিধার কোন অংশই বেতন হিসেবে গণ্য হবে না।

যেসকল শ্রমিক সরকারি মালিকানাধীন কর্পোরেশন সংস্থা ও কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রায়ত্ত ও সরকারি তত্বাবধানের অধিন ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে নিযুক্ত আছেন ও মাসিক ৩৫৫ টাকা পর্যন্ত বেতন পাচ্ছেন তাঁদের সাময়িক ভিত্তিতে এই হারে সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছেঃ

১।মাসিক বেতন ১২৫ টাকা পর্যন্ত মাসিক টাকা ২৫ টাকা।

২।মাসিক বেতন ১২৬ টাকা থেকে ২২৫ টাকা পর্যন্ত মাসিক ২০ টাকা। এই শ্রেণীভূক্ত কর্মচারীরা সর্বনিম্ন মাসিক ১৫০ টাকা পাবেন।

৩।মাসিক বেতন ২২৬ টাকা থেকে ৩৫৫ টাকা পর্যন্ত মাসিক ১৫ টাকা।

ক)এই শ্রেণীভূক্ত কর্মচারীরা সর্বনিম্ন ২৪৫ টাকা পাবেন।
খ) যে সকল কর্মচারীরা মাসিক ৩৪৯ টাকা পর্যন্ত বেতন পান তাঁদের জন্য মার্জিনাল এডজাস্টমেন্ট করা হবে।

এই সুবিধা স্থায়ী, অস্থায়ী, বদলী ও ওয়ার্কচার্জড, শ্রমিকরাও পাবেন।

সরকারের মালিকানাধীন বা তত্বাবধানকারী চা বাগানের শ্রমিকরা এই হারে এসব সাময়িক সুবিধা ভোগ করবেন।

ক)দুই সদস্যবিশিষ্ট অদক্ষ শ্রমিক পরিবার মাসিক অতিরিক্ত ২০ টাকা পাবেন।
খ)এক সদস্যবিশিষ্ট অদক্ষ শ্রমিক পরিবার মাসিক অতিরিক্ত ১০ টাকা করে পাবেন।

আমার শোষিত ভাই ও বোনেরা,

আমি বিশ্বাস করি, এই পদক্ষেপগুলি আপনাদের বর্তমান দূর্দশার কিছুটা লাগব করবে। অবশ্য জনগণের ভবিষ্যত জীবনের প্রকৃত মান উন্নয়ন এই বেতন বৃদ্ধির উপর কোনক্রমেই নির্ভরশীল নয়। সেটা তখনি সম্ভব হয়ে উঠবে যখন আমাদের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে পূনঃর্গঠিত এবং কারখানাগুলি পুরোমাত্রায় চালু হবে। আমরা এ পর্যন্ত কোন নতুন করে, খাজনা ধার্য করি নাই। আপনারা শুনে অবাক হবেন যে, আপনাদের এই বেতন বাড়াবার জন্য সরকারকে প্রতি বছর অতিরিক্ত ৩০ থেকে ৩৫ কোটি টাকা খরচ করতে হবে। কৃষক সর্বস্তরের জনসাধারণকে সুবিধা দেয়ার জন্য ইতিপূর্বে প্রায় ৭০ কোটি টাকার বকেয়া সুদ খাজনা ও কর মাফ করে দেওয়া হয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধি করে আমরা এই ঘাটতি পূরণ করতে পারি।

আমার গরীব শ্রমিক ভাই ও বোনেরা,

আপনারা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েমের উপযোগী সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করছেন। আমাদেরকে পরিশ্রম করতে হবে, উৎপাদনের লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। দেশের সম্পদ বাড়িয়ে আমরা জীবনযাত্রার প্রকৃত মান উন্নয়ন করলে সফল হবে। আজকের এই মে দিবসে আসুন আমরা এই শপথ গ্রহণ করি যে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য আমরা অবিরাম সংগ্রাম করে যাব। এ দেশের চাষী-তাঁতী কামার-কুমোর শ্রমিক ও মজলুম জনতার জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা কাজ করব। আমার পার্টির সহকর্মীগণ এবং সরকার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সজাগ যে, দুঃখের মধ্য দিয়ে আপনাদের দিন কাটছে। ঘরে খাবার নেই, পরনে কাপড় নেই, মাথা গুজবার জন্য নেই এতটুকু ঠাঁই। ইয়াহিয়ার বর্বর সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলা আপনাদের সবকিছু নষ্ট করে দিয়ে গেছে। তবে আপনারা সম্পূর্ণভাবে আশ্বস্ত থাকতে পারেন যে, এই বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পূনঃর্গঠনের জন্য জনগণের সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে আমরা আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করব।

ইতিমধ্যে কিছু সংখ্যক বিদেশী এজেন্ট ও দুস্কৃতিকারী স্বার্থান্বেষী মহল মানুষের দুঃখ-দূর্দশার সুযোগ নিয়ে মাঠে নামার চেষ্টা করছে। এদের অতীতের কার্যকলাপ আপনারা জানেন। আমার অনুরোধ আপনারা এই সমরাজ্যবাদী দালালদের সম্পর্কে সর্তক থাকবেন। কিছু কিছু দুস্কৃতিকারী জায়গায় জায়গায় শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করার জন্য চেষ্টা করছে। আপনারা তাদের উপর কঠোর দৃষ্টি রাখবেন। সরকার তাঁদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ভায়েরা আমার,

আমি আপনাদের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিব না। আপনারা জানেন আমি একবার কোন অঙ্গীকার করলে নিজের প্রাণের বিনিময়ে হলেও সেটা পালন করতে চেষ্টা করি। আমি বিগতদিনে যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সেগুলি পালনের চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমি আলাদিনের আশ্চর্য প্রদ্বীপ হাতে নিয়ে সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করিনি যে রাতারাতি সবকিছু ঠিকঠাক করে দেব। সমৃদ্ধির পথে কোন সংক্ষিপ্ত রাস্তা আমার জানা নেই। শতাব্দীর শোষণের পুঞ্জীভূত সমস্যা আমাদের সামনে জড়ো হয়ে রয়েছে। এগুলোর সমাধানের উদ্দেশ্যে কঠোর পরিশ্রম ও আরও আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তাহলেই আমরা আমাদের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার ভিত্তি গড়ে যেতে পারব। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্যে সেখানে বসবাস করতে পারব। খোদা আমাদের সহায় আছেন।

জয় বাংলা।